চ রি ত্র আর্কাইভস
-৪০৮-
বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......

শত শোষণেও বাংলাদেশ স্বর্ণ-প্রসবিনী

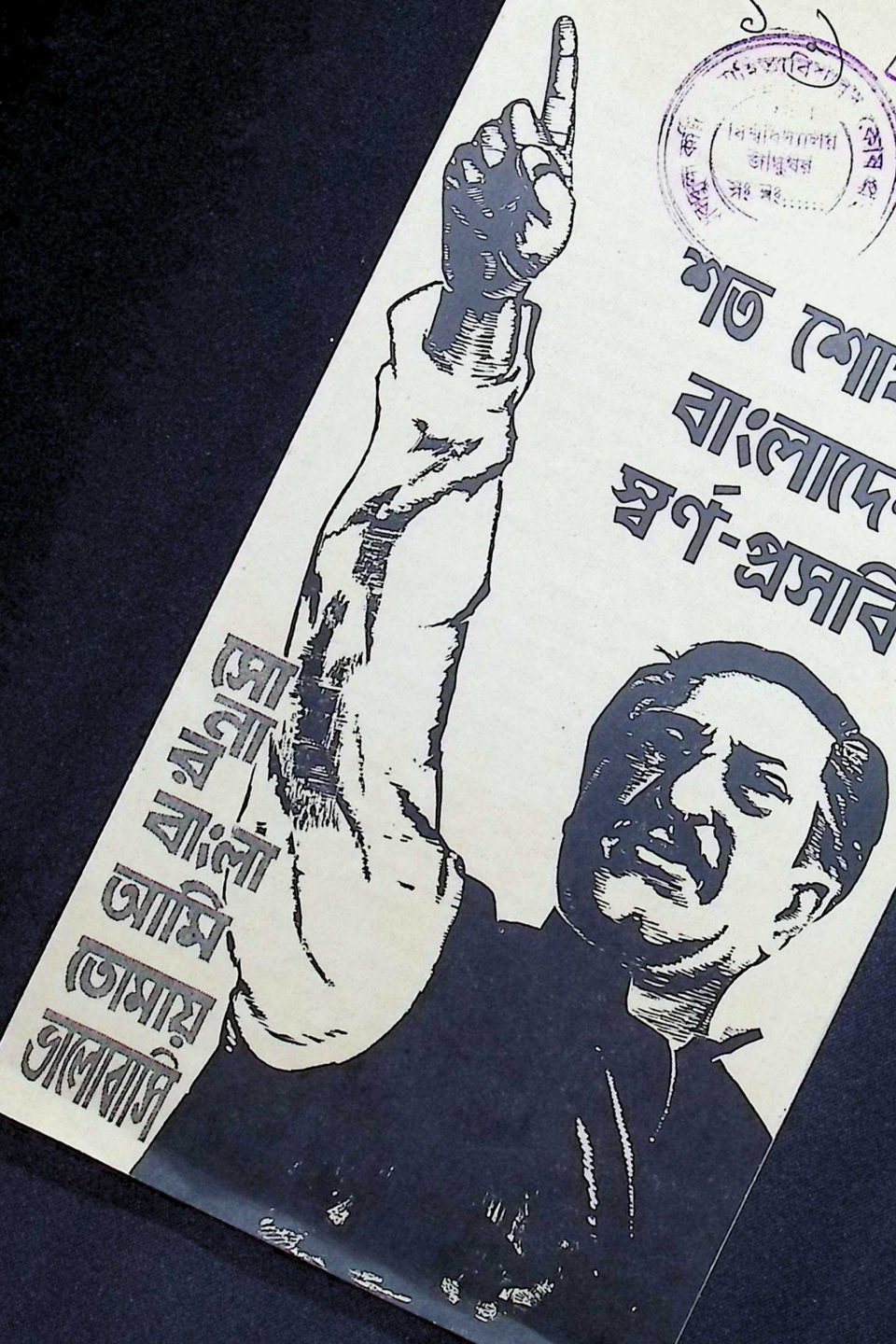

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বের অনেকে প্রশ্ন করছেন। তাদের প্রশ্ন, স্বাধীন বাংলাদেশ কি অর্থনৈতিক দিক থেকে টিঁকে থাকতে পারবে? সম্ভব হবে কি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে সুখী সমৃদ্ধ জীবন গঠন? আমাদের উত্তর, বাংলাদেশ কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে টিঁকে থাকবে তাই-ই নয়, আজকের চাইতে স্বাধীন বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন হবে অনেক সচ্ছল এবং সমৃদ্ধ। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় এটাই হবে অন্যতম সম্পদশালী রাষ্ট্র। বাংলাদেশের যা সম্পদ আছে তাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগিয়ে সুখী, উন্নত অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

পাকিস্তানে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল একটা কলোনি বা উপনিবেশ—পশ্চিম পাকিস্তানের ধনকুবেরদের উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা ঘটে, বাংলাদেশের ভাগ্যেও ঘট্ছিল তাই। বাংলাদেশের অর্থ গিয়ে জমছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ধনকুবেরদের পকেটে। বাংলাদেশ, তার নিজের অর্থনৈতিকজীবন নিজে নিয়ন্ত্রণে ছিল অক্ষম। অথনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ হল এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির নাগপাশ থেকে মুক্তি। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছিল না কিছুই, বরং সে হচ্ছিল শোষিত। এই শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস বর্ত্তমানে শেষ হতে চলেছে। আর তাই আজ বাংলাদেশে চলেছে এই রক্তক্ষরা যুদ্ধ। বাংলাদেশের বাতাস ভরে উঠেছে বারুদের গন্ধে।

বাংলাদেশের সম্পদ

ফরাসী অর্থনীতিবিদ, যাদের উল্লেখ করা হয় ফিজিওক্রাট বলে, তাঁরা মনে করতেন, কৃষিই একটি জাতির মেরুদণ্ড, একটি জাতির সম্পদের উৎস। আজকের দিনে নতুন করে অনেকেই ভাবছেন এদের ধারায়। একটা জাতিকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হলে কৃষি ছাড়া চলে না। পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। সব জাতিকে তাই ভাবতে হচ্ছে যতদূর সম্ভব নিজ নিজ দেশের কৃষিসম্পদকে বাড়িয়ে অন্নসমস্যা সমাধানের কথা। নিজের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করে কল কারখানা চালাবার কথা। বাংলাদেশ কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে, যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে তা থেকে এতকাল পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ করে আসা হয়েছে।

বাংলাদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিতে গড়া। এদেশের উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় উর্বর পলিমাটিতে গাছপালা সহজেই জন্মায়। এদেশের সাথে মেলেনা পশ্চিম পাকিস্তানের জনবিরল, তরুপল্লবহীন, উষর-মরুময় প্রকৃতির মানচিত্র। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ভূগোলের দিক দিয়ে পাঁচগুণের বেশী বড়। কিন্তু তবু বাংলাদেশে অধিক মানুষের বাস। কারণ, এদেশ সুজলা-সুফলা। বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ জমি থেকে ফসল ফলে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ জমি কর্ষণ উপযোগী। পশ্চিম পাকিস্তানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। কোথাও বছরে মাত্র ১০ ইঞ্চি কোথাও ২০ ইঞ্চি। সেচ ব্যবস্থা ছাড়া অধিকাংশ জমি চাষ করা চলেনা। যে সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে দেখা দিয়েছে লোনা ধরে জমি নষ্ট হবার সমস্যা। পশ্চিম পাকিস্তানের ৭০ লক্ষ একর জমিতে শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণ লবণ জমে গিয়েছে। আর কিছু বেশী জমলে, এসব জমিতে চাষ করা যাবেনা। ইতিমধ্যেই ৩০ লক্ষ একর জমি লবণ জমে চাষের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের জমির ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন সমস্যা নেই, একমাত্র সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের কিছু জমি ছাড়া। এখানকার পানিভেজা জলবায়ুতে জমিতে লবণ জমে লোনা ধরবার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না। বাংলাদেশ, তাই কৃষির দিক থেকে সোনার দেশ। বাংলাদেশে শতকরা ২০ ভাগ আবাদী জমিতে দু'বার ফসল ফলান চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে বছরে তিনবারও ফসল ফলান চলে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণ কর্ষণযোগ্য জমিতে দু'বার চাষ করা যায়। তা'ও ভালভাবে যায় না।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ উন্নত মানের পাট উৎপন্ন হয় এখানে। প্রতি বছর গড়পড়তায় বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হয়। পাট রপ্তানি করে ১৯৬৭–৬৮ সালে বিদেশ থেকে আয় হয়েছিল প্রায় ১৩৯ কোটি টাকা। আগে আরো বেশি হত। পাটের কিছু বিকল্প এখন প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তবু এখন বিদেশের বাজারে পাটের প্রচুর চাহিদা আছে। পাটের পরেই অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করতে হয় চায়ের কথা। ১৯৬৮–৬৯ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৯০০০ টন। এই উৎপাদনকে আরো বৃদ্ধি করা যায়। বাংলাদেশ থেকে প্রচুর চা বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ প্রতিবছর পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে ২২৫ কোটি টাকার উপর। এই টাকা স্বাধীন বাংলাদেশে কেবল মাত্র বাংলাদেশের প্রয়োজনেই ব্যয় করা যাবে। স্বাধীন বাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি পুরণে আর ব্যয়িত হবেনা। ব্যয়িত হবেনা পশ্চিম পাকিস্তানের আথিক উন্নয়নে। যার অর্থ হবে বহুলোকের কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের অর্থকরী কৃষিসম্পদ নানা ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া রবার গাছের উপযোগী। বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় রবার বাংলাদেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। চট্টগ্রামের রামু অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে রবার চাষ সাফল্য লাভ করেছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত রবার থেকে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা যাবে।

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের ঘাট্তি খুব বেশী নয়। বর্ত্তমানে চালের হিসাবে ২৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি। উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাট্তি পূরণ করা অসম্ভব নয়। এ যাবত বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা যখনই উঠেছে, পাকিস্তান সরকার বলেছে টাকা নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে টাকার অভাব হবেনা কারণ সে তার নিজের টাকাতেই এই পরিকল্পনায় হাত দিতে পারবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে সমুদ্র। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে যে প্রোটিন ঘাট্তি থাকে সামুদ্রিক মাছের সাহায্যে তা পুরণ করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ সামুদ্রিক মাছের ব্যবসা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাপানী জেলেরা কেবল তাদের নিজেদের দেশের কাছের সমুদ্রেই মাছ ধরেনা, বহু দূর দূর সমুদ্রেও মৎস শিকার করে। সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা করে কেবল বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান নয়, বিশ্ব-বাজারে মাছ ও মৎসজাত দ্রব্য থেকে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে বনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ একর। কিন্তু বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ একর। বাংলাদেশের বন থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৩,৮৬,০৩৪ কিউবিক ফিট তক্তা করার উপযোগী কাঠ পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের বন থেকে শিল্প-উপযোগী আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। যেমন নিউজ প্রিণ্ট ও কাগজ তৈরির জন্য নরম কাঠ। বাংলাদেশের বাঁশ, ঘাস ও আখের ছোবড়া থেকে ভাল কাগজ তৈরি করা যায়। নিউজ প্রিণ্ট ও কাগজ কেবল বাঙ্গলাদেশেই তৈরী হত, পশ্চিম পাকিস্তানে নয়। কিন্তু এই কাগজের ব্যবসাও প্রধানত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি দাউদের হাতে। আর বাংলাদেশে তৈরি কাগজ বাংলাদেশের মানুষকে কিনতে হোত পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে বেশী দামে। স্বাধীন বাংলাদেশে এরকম অজব ব্যাপার আর ঘট্তে পারবে না।

শিল্প সম্ভাবনা

বাংলাদেশে কলকারখানা গড়ে তুলবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশে গত ২৩-২৪ বছরে যে পরিমাণ কলকারখানা গড়ে উঠেছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেই যথেষ্ট ছিলনা। স্বাধীন বাংলাদেশে কলকারখানা গড়ে তুলবার জন্য যে অর্থ লাগবে তা পাওয়া যাবে কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে। আমাদের দেশে কাজ করবার লোকের অভাব নেই। আমাদের দেশে শ্রম সস্তা। শ্রম সস্তা বলে কম পুঁজিতে (Capital) এখানে কলকারখানা চালু করা সম্ভব। আমাদের অর্থনীতিতে বর্ত্তমানে শ্রমের প্রাচুর্য (labour intensive) দিয়ে পুঁজির অপ্রাচুর্যকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। পরে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে হবে মজুরের মজুরী বৃদ্ধি। দেখা দেবে আথিক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি। বাংলাদেশে এখন যেসব কলকারখানা আছে তার অনেকগুলির মালিক হল পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। তাই এই সব কলকারখানার আয়ের টাকা চলে যায় পশ্চিম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং.....

পাকিস্তানে। কিন্তু ভবিষ্যতে টাকার এই চালান বন্ধ হবে। বাংলাদেশের কারখানার আয় পুঁজি হিসাবে খাটবে বাংলাদেশেই। এর ফলে পুঁজির মাত্রাবৃদ্ধি হবে দ্রুততর।

বাংলাদেশে মজুরীর হার সস্তা। বাংলাদেশে বাইরে থেকে তুলা রপ্তানি করে, এখানে বয়ন শিল্পের যথেষ্ট প্রসার করা চলে। বিশ্বের বাজারে সস্তায় উৎপাদিত কাপড় প্রতিযোগিতামূলক দামে বেচে যথেষ্ট লাভ করা সম্ভব। তা ছাড়া দেশের মানুষের বস্ত্রের চাহিদা মেটাবার জন্যেও বহু বস্ত্রের প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে ১০টি কাপড়ের কল ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর বাংলাদেশে যে হারে কাপড়ের কল হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। বাংলাদেশের বাজারে তাই পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড় বিক্রী হত। বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশের জলবায়ু বস্ত্র শিল্পের উপযোগী। একদিন বাংলাদেশ ছিল বস্ত্রশিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। ইউরোপীয় বণিকরা বাংলাদেশের প্রতি প্রধানত আকৃষ্ট হয় বাংলাদেশের তৈরি কাপড় বেচে ব্যবসায় লাভ করার জন্য। ফরাসী পর্যটক বেরনিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বাংলাদেশে আসেন। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, বাংলাদেশকে বলা যায় সারা পৃথিবীর বস্ত্রের আড়ত।

বাংলাদেশের মাটির নিচে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট নয়। তবে অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস, অনেক দিন পর্যন্ত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এছাড়া বগুড়ার জয়পুরহাট অঞ্চলে কয়লাখনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। খুঁজলে বাংলাদেশের মাটির নীচে কোথাও তেলও পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রতীরে জোয়ার ভাঁটায় যে শক্তি তৈরি হয়, তা থেকে ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে আরও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এই ভাবে কল-কারখানা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব বহুল ভাবে পুরণ করা চলবে।

যুদ্ধক্ষতি ও পুনর্গঠন

যুদ্ধে ক্ষতি হয় সেই সব দেশের বেশী যাদের অর্থনীতি বিশেষ ভাবেই কলকারখানা নির্ভর। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ ভাবেই কৃষি নির্ভর। জমি থাকবে। সব কৃষক যুদ্ধে মরে যাবে না। তাই ফসল উৎপাদন বন্ধ হবেনা। কলকারখানা গত চব্বিশ বছরে যা গড়ে উঠেছিল, মনে হয়, দখলদার বাহিনী দেশ ছাড়বার আগে তার বহু কিছুই ভেঙ্গে দিয়ে যাবে। এসবই আমাদের নতুন করে গড়তে হবে। তবে যুদ্ধের শেষে সবদেশের মানুষের মনেই বিশেষ ধরণের নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম পরিলক্ষিত হয়। এই নিষ্ঠা ও উদ্যমের জোরে একটা দেশ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি অনেক দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের হয়েছিল ভয়াবহ ক্ষতি। কিন্তু তারা তাদের এই ক্ষয়ক্ষতিকে দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তাদের নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার ফলে। যুদ্ধশেষে আশা করা যায় আমাদের মধ্যেও জাগবে গঠনমূলক কর্মোদ্যম। আমরা যেমন এখন একযোগে লড়ছি, তখনও একযোগে কাজ করব দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য।

পাকিস্তান এপর্যন্ত বহু বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ পেয়েছে। কিন্তু এই সাহায্য ও ঋণের টাকার মাত্র শতকরা ১০–১৫ ভাগ খরচা হয়েছে বাংলাদেশের জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ এখন যা সাহায্য ও ঋণ পাবে তা সরাসরি কাজে লাগাবে বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এমন, যে বর্ত্তমান বিশ্বে তার সামরিক গুরুত্ব আছে যথেষ্ট। আর কোন কারণে না হোক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও অনেক রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে বাংলাদেশকে সাহায্য দেবার জন্য। অবশ্য সাহায্য গ্রহণের আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে কিনা।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলির সম্বন্ধ হবে মৈত্রীপূর্ণ। এই সব রাষ্ট্রের সাথে সে আরম্ভ করতে পারবে সহজে ব্যবসা বাণিজ্য। আর এই বাণিজ্যের মধ্য দিয়েও ঘট্‌বে তার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। আজকের দিনে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে যথাযথ রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেলে জনসাধারণ নিজেই এক বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। জনসমষ্টি একটা দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক বোঝা নয়, অর্থনৈতিক শক্তির উৎস। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষের শ্রমেই সৃষ্টি হয় সম্পদ। কোন দেশের মানুষকে কাজে লাগাতে না পারলে, উদ্বুদ্ধ না করতে পারলে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়না। আশা করা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষ যথাযথ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাবে।

একটা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের কর্মকুশলতা ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর। আগামী বাংলাদেশের সমাজ সংগঠন গড়ে উঠবে তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে।

—অধ্যাপক সামাদ

সাহিত্যবিশারদ কোষ প্রত্নাগার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সং নং ৪০৮

জয় বাংলা

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য দশ পয়সা মাত্র

চবি জা আর্কাইভজ
৪০৬